হয়েছেন এবং অনস্বীকার্যভাবেই চলচ্চিত্রশিল্পের আরও পরিণত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। কাজেই বাংলাদেশের বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের সমর্থকদের তাদের পশ্চিমা সহযাত্রীদের চেয়ে আরও খারাপ শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই অন্ধকারে আশার একমাত্র আলো এই যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যদিও তা হতে যাচ্ছে দুঃখজনকভাবে দীর্ঘ।

অনুকূল ভূমি

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভূমি বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অনুকূল, এমনকি টেলিভিশনের চেয়েও। গত কয়েক বছরে চলচ্চিত্রের টিকিটের ওপর ভারী কর আরোপ এবং টিকিট থেকে লাভ করার চেষ্টা, সরকারি ভর্তুকিপ্রাপ্ত টেলিভিশন নেটওয়ার্কের তরফ থেকে বাড়তে থাকা প্রতিযোগিতা এবং প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাবৃদ্ধির শামুকগতি — এমন অনেক নির্মমভাবে অসহায় করে দেওয়ার মতো বাধা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে দর্শকসংখ্যা বেড়েছে। সত্যি কথা বলতে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা এতই উৎসাহব্যঞ্জক যে অন্য দেশগুলোতে চলচ্চিত্র যখন জাদুঘরে চলে যাবে, তখনও যে কয়েকটি দেশে চলচ্চিত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে তার মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশ থাকবে। দায়িত্বহীন অর্থলিপ্সুদের হাতে এমন সম্ভাবনাময় একটি শিল্পের আরও পতন ঠেকাতে সচেতন চলচ্চিত্রপ্রেমীরা যথোচিতভাবেই অভিযানে নামতে পারেন।

শৈল্পিক চলচ্চিত্রের জন্য যা জরুরি

চলচ্চিত্রশিল্পের কাঠামো সরাসরি নিজের নমনীয় (Plastic)[১] প্রকৃতি প্রকাশ করে; নমনীয় কারণ এটি সবচেয়ে জটিল অনুভূতিও বাহ্যিকভাবে অর্থাৎ দৃশ্যগতভাবে তুলে ধরতে পারে। কাজেই আমরা এই গুণটিকে নমনীয়তা হিসেবে উল্লেখ করব। মঞ্চের প্রকৃত কাল এবং প্রকৃত স্থানের বিপরীতে চলচ্চিত্রের আছে চলচ্চৈত্রিক কাল এবং চলচ্চৈত্রিক স্থান। মঞ্চে অভিনেতা যদি এক প্রান্ত থেকে

১. *plastic?????????*

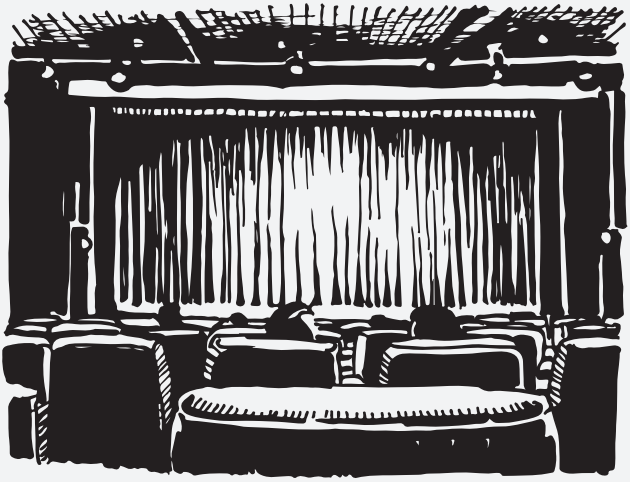

* অন্য দেশগুলোতে চলচ্চিত্র যখন জাদুঘরে চলে যাবে, তখনও যে কয়েকটি দেশে চলচ্চিত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে তার মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশ থাকবে।
* উপযুক্ত পরিবেশ এবং শিল্প-সংশ্লিষ্টদের নিষ্ঠা থাকলে সবচেয়ে নিষ্পেষিত জাতিও জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকৃত চলচ্চিত্র অর্জন করতে পারে।

* আমাদের চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং নির্মাতাদের একটি বড়ো অংশ বাংলাদেশে বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই রাখেননি।

* এই অন্ধকারে আশার একমাত্র আলো এই যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে

অপর প্রান্তে যেতে চান, তবে তাকে প্রকৃত সময়ে প্রকৃত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু চলচ্চিত্রে একই কাল এবং স্থান অতিক্রান্ত হয় চলচ্চিত্রের নিজস্ব খুবই নমনীয় ব্যবস্থায়। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, কাল এবং স্থান দুটোকেই যে-কোনও মুহূর্তেই মাধ্যমের অভিব্যক্তি অনুযায়ী তাদের নিজস্ব মাত্রার তুলনায় সম্প্রসারিত বা সংকুচিত করা সম্ভব। মঞ্চে একজন অভিনেতা পুরো আয়োজনের অর্থাৎ, অন্যান্য পারফর্মার, প্রেক্ষাপট, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির একটা অংশ মাত্র, সেই অভিনেতার চরিত্রটি যতই দৃষ্টি আকর্ষণ করুক না কেন। দর্শকের কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ পেতে তাঁর হাতে একটাই উপায় বা অস্ত্র আছে, আর তা হলো নিজের ভোকাল কর্ডের ব্যবহার। কাজেই তিনি যদি কোমল অনুভূতিও মান্ধাতার আমলের দরবারি ঘোষকের মতো উচ্চ স্বরে প্রকাশ করতে বাধ্য হন, তাঁকে আমাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। কিন্তু চলচ্চিত্র একজন অভিনেতাকে তাঁর পারিপার্শ্বিকতা থেকে আলাদা করে ফেলার ক্ষমতা রাখেন, যার ফলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি কিংবা গতি দর্শকের ওপর সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলে। এই সরল উদাহারণগুলোই বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রে অভিব্যক্তি প্রকাশের ধরন কতটা স্বতন্ত্রভাবে আলাদা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের অনেক নির্মাতাই যাঁরা ক্যামেরা দিয়ে মঞ্চনাটক ধারণ করছেন তাঁরা এই স্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে পারতেন, যদি তাঁরা কেবল কয়েক মুহূর্ত এটা নিয়ে চিন্তা করতেন এবং দ্রুত মুনাফা অর্জন আর খ্যাতির দাবির প্রতি দুর্নিবার আসক্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারতেন।

তিন ধাপে পরিবহণের কলা

এই পর্যায়ে, চলচ্চিত্রের আরেকটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, যেটি একে অন্য শিল্প থেকে আলাদা করে সেটি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । মঞ্চে একজন অভিনেতা তাঁর অভিব্যক্তি সরাসরি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। একে বলা যাক, *প্রাথমিক পরিবহণের কলা*। একজন লেখক কাগজে তাঁর চিন্তা ঢেলে দেন, তারপর পাঠক তা পড়েন। কাজেই সাহিত্য হচ্ছে *মাধ্যমিক পরিবহণের কলা*। চলচ্চিত্রে অভিনয়শৈলী ফিল্মে ধারণ করা হয়, পরে ফিল্ম থেকে পর্দায় প্রক্ষেপণ ঘটানো হয়, পর্দা থেকে এটি দর্শকের চোখের রেটিনায় পৌঁছায়। কাজেই চলচ্চিত্র হচ্ছে তিন ধাপে পরিবহণের কলা। প্রাথমিক পরিবহণের কলায় মূল কাজটি সরাসরি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা থাকে। অন্যদিকে চলচ্চিত্রে সেটা কেবল তখনই সম্ভব যখন তিন ধাপের পরিবহণে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রগুলো নিখুঁতভাবে কাজ

জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের বেলায়ও এ কথা খাটে। বিজ্ঞান ও সংগীতের মধ্যেও এ ধরনের সম্পর্ক সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব এবং আরও বোধগম্যভাবে বিজ্ঞান ও চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যে।

শঙ্কা এবং ভীতির জন্য জায়গা রেখেও, এটা নিরাপদেই বলা চলে যে, মোটাদাগে মানবলব্ধ জ্ঞানের সব শাখা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থেকেও স্বাধীন। কিছু মানুষ এই স্বীকৃত সত্যকে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক উপলব্ধি করে মিছে আনন্দও বোধ করতে পারেন। চেহারায় 'বলেছিলাম না' ধরনের হাসি নিয়ে, তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে, আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প, নাটক বা টিভি প্রযোজনার নিম্নমানের, কারণ হলো, আমাদের প্রাচীনতম শিল্পমাধ্যম, সাহিত্যের নিম্নমান। যদি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়, তবে এটি মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যুক্তি, যার উদ্দেশ্য হলো ব্যর্থতা এবং অদক্ষতাকে গোপন করা। মানবলব্ধ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্কের মানে এই নয় যে এগুলো একই সুতায় বাঁধা এবং একটির উন্নয়নে অপরটিরও যথাযথ উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি সাহিত্য শতকের পর শতক পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে কিন্তু যুক্তরাজ্য একই সময়ে বিথোভেন, ওয়াগনার বা ব্রামসের মতো একজন সংগীতস্রষ্টাও তৈরি করতে পারেনি। যদিও ব্রিটেন এই চলচ্চিত্র প্রযুক্তির প্রবর্তকদের একটি, তবে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ চলচ্চিত্রশিল্পও অন্যদের থেকে দুঃখজনকভাবে পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ মঞ্চনাটক এখনও বিশ্বসেরা।

আমাদের ভূমিতে পা দিয়ে হয়তো কেউ বলতে পারেন আমাদের সংগীত শত শত বছর ধরে এমন পরিপক্কতা অর্জন করেছে, যা আমাদের সাহিত্যের জন্য অর্জন করা খুবই কঠিন; যদি না ভবিষ্যতে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের মতো বুদ্ধিগত স্ফুরণ ঘটে। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ পরস্পর নির্ভরশীল, কারণ ব্যক্তি এবং সমাজের মেধার সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের বিকাশ ঘটে। একটি শিল্পমাধ্যমের উন্নতি বা অবনতি অন্যটির উন্নয়নে প্রভাব ফেলতেই পারে, তবে তা যে অবশ্যই ঘটবে এমনটা নয়। এসবই তুলে ধরে যে, একজন চলচ্চিত্র-সমালোচকের অবশ্যই সমাজ ও অন্য শিল্পমাধ্যমের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব এবং তার উলটোটাও বোঝার ও মূল্যায়নের ক্ষমতা থাকতে হবে।

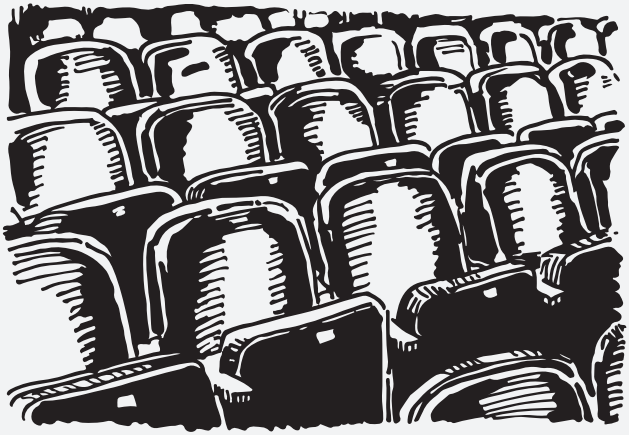

* একটি সত্যিকারের শিল্পকর্ম একজন সমালোচকের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ।

* প্রায় প্রত্যেক দর্শকই সচেতন বা অবচেতনভাবে, ভাষায় প্রকাশ করে বা না করেও একজন সমালোচক।

* মজ্জাগত অক্ষমতা অচিরেই নানা কুৎসিত ডালপালাসহ বৈষয়িকতার কুৎসিত মহিরুহে পরিণত হয়।

পরিপ্রেক্ষণ বোধ

চলচ্চিত্র-সমালোচককে একজন দারুণ সচেতন ব্যক্তি হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক মূল্যায়নের জন্য পরিপ্রেক্ষিত জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ অবস্থার মাঝ থেকে তার আলোচ্য বিষয়টিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য একজন সমালোচককে যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে। আমাদের শিল্প-সমালোচনায় পরিপ্রেক্ষণ বোধ খুবই দুর্বল এবং চলচ্চিত্র-সমালোচনা এর সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হালের ধারা এবং বিশ্ব জুড়ে যে অগ্রগতি হচ্ছে তার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করেই কাজের সমালোচনা করা হয়, ইচ্ছা এবং দক্ষতা থাকলে এসবের হদিস রাখা মোটেও কঠিন নয়। একে ফেলিনির চলচ্চিত্রের সঙ্গে স্থানীয় প্রযোজনার তুলনা করার মতো হাস্যকর অভ্যাসের সঙ্গে অবশ্যই মেলানো যাবে না। সরাসরি তুলনা নয়, বরং ফেলিনি সম্পর্কে সচেতন হয়ে একটি স্থানীয় প্রযোজনার গুণাবলি যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

একজন চলচ্চিত্র-সমালোচকের জন্য বহুমুখী বিবেচনাবোধ কৌশল আয়ত্তে আনা অপরিহার্য। আর এটি একজন সমালোচকের প্রাথমিক যোগ্যতাকে নির্দিষ্ট করে সংজ্ঞায়নের কাজটি খুব কঠিন করে তোলে। তার পরও বাংলাদেশে চলচ্চিত্র-সমালোচনার দশা দেখে বলতেই হয়, অন্তত ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র-সমালোচকদের সাহায্য করার জন্য কিছু প্রাথমিক নির্দেশনা আবশ্যিক। স্বাভাবিকভাবেই, এগুলো কেবল নির্দেশনাই হবে, অপরিবর্তনীয় নিয়ম নয়, যা সময় এবং পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে মানতেই হয়।

আবশ্যিক শর্তসমূহ

(ক) সামাজিক সচেতনতা: প্রত্যেক শিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করা। একজন সমালোচক একটি নির্ধারিত মুহূর্তে সমাজের চাহিদা সম্পর্কে এবং তার সামাজিক সঙ্গীদের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে কী ধরনের অনুপ্রেরণা প্রয়োজন সে বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকবেন। অন্য কথায়, সামাজিক-

খেলতে হচ্ছে যা বিধিসম্মত মাঠের আকারের তুলায় বড়ো কিংবা ছোটো। প্রথম শ্রেণির ফুটবলারেরা সেখানেও হয়তো মাঝেমধ্যে তার লক্ষ্য খুঁজে পাবেন, তবে তার মনোযোগের অধিকাংশই খরচ হয়ে যাবে সে খেলার প্রাথমিক বিষয়গুলো মেনে চলার চেষ্টা করতে গিয়ে। একইভাবে, একজন সমালোচককে এমন একটি ক্ষেত্রের ফসল একত্র করতে বাধ্য করা হন, যার ফসল হয়তো তিনি চিনে থাকবেন কিন্তু ক্ষেত্রের বিস্তৃত জানেন না। এতে করে একজন সমালোচকের সৃজনশীল প্রবৃত্তি চাপা পড়ে, এমনকি পঙ্গুত্বও বরণ করে। সৃজনশীল ক্ষমতা একমাত্র তখনই বেড়ে ওঠে যখন চিন্তা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে।

কিন্তু সত্যিকারের প্রতিভার কোনও বাধা মানে না, এমন সমালোচকও আছেন যাঁরা বিশ্বাসজনকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, যদিও সমালোচনার জন্মই হয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে তবুও আত্মম্ভরিতা এড়িয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা, পরিমিতিবোধ এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন, যা সহজে পাওয়া যায় না। এমনটি দেখা গেছে যে, একটি ভালো সমালোচনায় এমন সব ব্যাপার আলোচিত হয়, যা সমালোচিত শিল্পীরও চিন্তায় ছিল না। এটা সব শিল্পের জন্যই সত্য (সম্ভবত, সংগীত ব্যতিক্রম হতে পারে কারণ এর অতিশয় বিমূর্ত প্রকৃতির মধ্যে সমালোচকের মুক্ত চলাচলের জন্য তেমন কোনও জায়গা থাকে না) এবং সৎ শিল্পীরা সব সময়ই সুবিদিত এবং সুশিক্ষিত সমালোচনাকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য হিসেবে মূল্য দিয়ে এসেছেন, তা সে 'বিধ্বংসী' হোক বা 'গঠনমূলক' হোক।

সামাজিক বাস্তববাদীরা পছন্দ করুক বা না-ই করুক, তবুও সত্য এই যে, আজ পর্যন্ত, বেশিরভাগ মহৎ কাজই অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, পূর্বচিন্তা দিয়ে নয়। শুধু মহৎ কাজই-বা কেন? প্রায় যে-কোনও শিল্পীকেই তার কাজকে ব্যাখ্যা করতে বললে অবোধ্য এমনকি অযৌক্তিক কারণ দেখাবেন। একটি কাজ এবং মানুষজনের মধ্যে, যাতে শিল্পী নিজেও রয়েছেন, বিরাজ করে এক অবোধ্যতার শূন্যতা। ঠিক এখানেই জায়গা একজন সমালোচকের, একজন ঠান্ডা মাথার বিজ্ঞানীর মতো সেটির গুণ যাচাই করেন তাঁর জ্ঞান, পর্যবেক্ষণক্ষমতা, উপলব্ধিবোধ দ্বারা, আর এর সবই ধাবিত হয় একজন সৃজনশীল শিল্পীর অনুরাগের দেখানো পথে। তাঁর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, বিবরণ ও নির্ভুল পরিবেশনার জন্যই সবাই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখবে। সমালোচক শুধু একজন পথপ্রদর্শক, একজন শিক্ষক, একজন ব্যাখ্যাকারীই নন, সেই সঙ্গে তিনি একজন সহরচয়িতা,

* সৃজনশীল ক্ষমতা একমাত্র তখনই বেড়ে ওঠে যখন চিন্তা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে।

* সমালোচক শুধু একজন পথপ্রদর্শক, একজন শিক্ষক, একজন ব্যাখ্যাকারীই নন, সেই সঙ্গে তিনি একজন সহরচয়িতা,

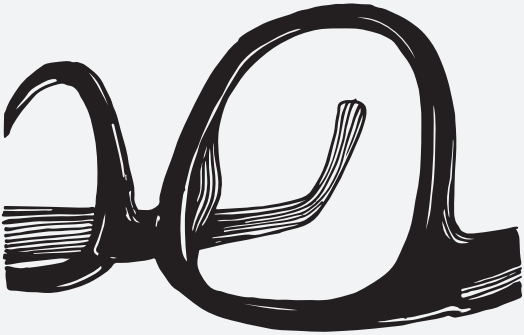

* শিল্পের প্রতি খাঁটি ভালোবাসা একজন চলচ্চিত্র-সমালোচকের জন্য অপরিহার্য।
* ভালো মানের নিয়মিত দর্শক হয়ে ওঠার জন্য একজন ব্যক্তিকে এমন মনের অধিকারী হতে হবে, যা সীমাবদ্ধতা ও সামাজিক-ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত

যিনি একটি শিল্পের সত্যিকারের বুদ্ধিবৃত্তিক অবয়বটি প্রদান করেন, যাতে করে এটি লোকের কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। দিনশেষে উপযোগিতাই সকল শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য (স্বাতন্ত্র্যবাদীদের জোরালো অস্বীকৃতি সত্ত্বেও)। একজন সমালোচক একই সঙ্গে একজন স্রষ্টা এবং একজন ব্যাখ্যাকারী, যা কোনও মানুষের জন্যই একটি অনন্য, দুরূহ এবং গুরুতম দায়িত্বের সম্মিলন।

তা সত্ত্বেও সমালোচনা সম্ভবত এ দেশে একমাত্র চর্চা, যেটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে পাঠকদের ওপর সমালোচকদের প্রভাবকে সচেতনভাবে স্বীকৃতি না দিয়ে অবচেতনভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া, বেশিরভাগ 'সমালোচক' এই উদাসীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁদের অর্জন নান্দনিক কিছু নয় বরং সাংসারিক।

একদিকে, এটা সত্যি যে মাঝারি বা নিম্নমানের কাজ সমালোচকের বিশ্লেষণ ক্ষমতার জন্য প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। অন্যদিকে, এটাও সত্য যে একটি ভালো মানের শিল্পকর্ম সমালোচকের জন্য বড়ো পরীক্ষা হলেও তা তাঁর সেরাটা বের করে আনতে সক্ষম। জ্যাঁ পল সার্ত্র এবং কেনেথ টিন্যানের মতো লোকেরা সমালোচকের মর্যাদাকে মহৎ শিল্পীদের সমপর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং তরুণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা অবশ্যই তাঁদের থেকে পথের দিশা নিতে পারেন। তবে প্রাথমিক পূর্বশর্ত এই যে তাঁদের অতি উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন হতে হবে কারণ সমালোচকের এই গুরুদায়িত্বে অপেশাদারিত্ব এমন একটি জিনিস, যাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে।

পরিশেষে, সমালোচনার মান বৃদ্ধি যে কোনও স্বতন্ত্র্য ব্যাপার নয়, এটি পুনরায় জোর দিয়ে বলছি। সমান্তরালে চলতে থাকা শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত ও বিবর্তিত হয় এটিও। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত। একজন চলচ্চিত্র-সমালোচকের পক্ষে একটি অসাধারণ বিশ্লেষণ লিখে ফেলা সম্ভব নয়, যদি না তাঁর বিষয়বস্তু এমন জিনিস হয়, যেমন জিনিস সাধারণত আমাদের স্টুডিওগুলো বানায়।

পত্রিকার সে সময়ের পছন্দ-অপছন্দ সেখানে প্রকাশিত 'পর্যালোচনা'গুলোকে প্রভাবিত করে। জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত কিছু 'পর্যালোচনা'য় কদাচিৎই এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, যা শিল্পে আগ্রহী পরিচালকদের কাজে আসে। বাণিজ্যিক বিবেচনার চাপে বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই সমালোচনার মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ হতে বঞ্চিত হয়। সাধারণত যে ভাষায় মাঝারি মানের চলচ্চিত্রগুলোরও প্রশংসা করা হয় তা হতভম্ব করে দেয়।

অপেশাদার অনধিকারচর্চাকারী

পূর্বের অনুচ্ছেদগুলোতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখালেখির মান নিয়ে বলছিলাম এবং ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লেখক, যাঁরা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্ব ছাড়া অনধিকারচর্চা করছেন, তাঁদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যাঁদের প্রয়োজনীয় আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও শেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি, আমার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে নয় । এ ধরনের লেখকদের বেশিরভাগই নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন; সত্য মেনে নিয়ে সীমার মধ্যেই নিজেদের সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ ছাড়াই আমার সমালোচনা তাঁদের প্রতি, যাঁরা জ্ঞাত হওয়ার ভান করেন এবং তা বৈষয়িক স্বার্থে ব্যবহার করেন, এবং সাংবাদিকতার সুবিধা ব্যবহার করে নির্মাতাদের প্রভাবিত করতে চান। যে ক্রমাগত উত্তেজনা আর ঠোকাঠুকি চলচ্চিত্র-নির্মাতা আর চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের মধ্যে লেগেই থাকে সে ব্যাপারে লিখতে আমি ঠিক স্বস্তিবোধ করি না কারণ এ জায়গাটিকে দুই পক্ষই একত্রে কলুষিত করে চলেছে; এমনকি আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনে এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা অঙ্গনে যা-কিছু খারাপ তার পেছনে এটি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। তাঁদের এই ভূমিকার জন্য আজকে একজন নির্মাতা ভাবেন যে তিনি জুতসই কিছু 'পর্যালোচনা' 'কিনতে' পারবেন। যদি তিনি তা 'কিনতে' না পারেন এবং 'পর্যালোচনা' নেতিবাচক হয় তবে তিনি বর্বরভাবে রেগে যান অথবা ঠিকমতো জনসংযোগ করতে না পারায় নিজেকে দায়ী করেন। তবুও এটি এমন একটি অবস্থা, যেটি নির্মাতারা বুঝতে পারেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দৃশ্যে অন্য আরেক ধরনের সমালোচকের আগমন ঘটে, যার সঙ্গে চলচ্চিত্র জগতের কারওরই ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক নেই, নিরাসক্তভাবে সমালোচনা করতে শুরু করেন, তখন নির্মাতা হতবুদ্ধি হয়ে যান। কারণ এই নতুন সমালোচক, দক্ষ বা অদক্ষ, সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত এবং যার ওজন ঠাহর করা যায় না এবং এখানে এহেন

* কোনও ভালো সমালোচক বা যে-কোনও লেখকেরই যে অত্যাবশ্যকীয় গুণগুলো থাকা প্রয়োজন, তা হলো মেধা, সততা এবং উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা। শুধু মেধা প্রকৃতি এবং সভ্যতার উপহার এবং বাকিগুলো ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব।

* একজন অন্ধ হয়ে বাকি অন্ধদের নিকট হাতির বিবরণ দেবার মতো করে তিনি তাঁর পাঠকদের ভুল পথে পরিচালিত করছিলেন।
* কলকাতায় প্রকাশিত ফরাসি নামগুলোর বাংলা উচ্চারণগুলো অনুসরণের প্রবণতাও রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তারাও ভুল করতে পারে এবং করে।

অনিশ্চয়তা কাম্য নয়। সঙ্গে সঙ্গেই এই নতুন সমালোচককে প্রধান শত্রু বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদমূলক প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। বাস্তব উদাহরণ থেকে দেখা যায় জনসম্মুখে গালাগালি করা থেকে শুরু করে পিটুনি দিয়ে পর্যন্ত তাঁদের এই রাগ ঝাড়তে হচ্ছে।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় আছেন, এমন কারও কাছে চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখালেখি নিয়ে করা আমার এই মন্তব্য হয়তো রূঢ় মনে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, অপ্রিয় সত্য বলে ফেলাই উচিত, তা সে যা-ই হোক না কেন। আমার মতে, যারা যে-কোনও শিল্পসংক্রান্ত যে-কোনও পেশাতেই ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা ছাড়া শুধু বৈষয়িক সুবিধা লাভের জন্য (অন্য কোথাও যে সুবিধা পেতে তারা ব্যর্থ হয়েছে) অনধিকারচর্চা করেন তাদের এর ধারেকাছে ঘেঁষারও কোনও নৈতিক অধিকার নাই। যদি কোনো চলচ্চিত্র সাংবাদিকের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি কোনো ভালোবাসা বা সম্মান না থাকে তাহলে তারাও এর মাধ্যমে এক ধরণের অপকর্ম করে যাচ্ছেন। আশা করি সত্যিকারের চলচ্চিত্র সাংবাদিকেরা আমার সাথে একমত হবেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের দুরাবস্থার জন্য তারাও কোনো অংশে কম দায়ী নয়।

বিদেশি ছবি নিয়ে প্রবন্ধ

চলচ্চিত্র-সমালোচনার অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে উচিত হবে পৃথিবীর নানা চলচ্চিত্র নগরীগুলোতে বানানো ছবিগুলোর ওপর লেখা ফিচারের ওপর মন্তব্য করা, যেগুলো নামীদামি ফিচার এজেন্সিগুলো জোগান দেয় এবং তাদের দৃষ্টি ঘনীভূত থাকে সেসব বিষয়ে, যা ব্যবসায় এবং 'জনপ্রিয়তা'র (Pop) (একটি অপব্যবহৃত শব্দ) সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই ফিচারগুলো, সাধারণত অলংকৃত করা হয় অভিনেত্রীদের খোলামেলা উত্তেজক ছবি দিয়ে। বাংলা কিংবা ইংলিশ যে ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, চলচ্চিত্রবিষয়ক ফিচারের মধ্যে এগুলোই সম্ভবত সবচেয়ে কম পঠিত এবং এগুলোর একমাত্র আকর্ষণ হলো ছবিগুলো।

সাধারণ পাঠকেরা বেশিরভাগ সময়ে বিদেশি ছবির ওপর বিদেশি লেখকের লেখা প্রবন্ধ বা ফিচার পড়তে আগ্রহ পায় না। এটি পৃথিবীর সর্বত্র সত্য। এমনকি গ্রেট ব্রিটেনেও বিদেশি লেখক যদি ভাগ্যবান বা নামিদামি না হন, তাহলে নন-